Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501002 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

The Saga of Social Evolution in Sanjib Chattopadhyay's Stories
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে সমাজ বিবর্তনের উপাখ্যান

Dr. Antara Choudhury
Assistant Professor
Bengali Department, Bhagalpur National College
Bihar

Received on: 20th February 2026
Accepted on: 09th February 2026

Abstract:
Life is a ceaseless flow. It holds joy and sorrow; it encompasses love and separation; it features laughter and tears. It is, in essence, replete with a myriad of such emotions. From the various vicissitudes and trials of life, individual stories are born. What truly matters is how one chooses to perceive this existence. The perspective of the veteran litterateur Sanjib Chattopadhyay is entirely distinct. He presents even the most complex issues wrapped in the garb of humour. Be it marital dynamics or bureaucratic red tape — whether the subject is romance or corruption — his mode of presentation displays a remarkable mastery. At times he appears indignant, at others defiant; yet, his style of expression invariably leans toward satire. He employs novel metaphors and unique diction, creating a distinct impact on the reader's mind. Simultaneously, he unveils the contours of social evolution. Amidst the refreshing openness of dialogue and exposition, he reveals entirely new horizons of thought. One is left to marvel: can events witnessed right before one's eyes be interpreted in such a manner? A simultaneous wave of wonder and deep admiration washes over the reader's mind. The present essay attempts to analyze this novel style of expression by drawing upon examples and metaphors from several of his stories.

Key Words:
Sanjib Chattopadhyay, Society, Evolution, Laugh, Poetic Inquiry, Atul Chandra Gupta, Humour, Satire, Wit, Fun, Comic Sensibility, Document.

মূল আলোচনা

হাসি আমাদের জীবনের এক মৌলিক অনুভূতি। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কারণে আমরা হাসি। সব ক্ষেত্রে যে হাসি মধুর হয় তা নয়, হাসির বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। প্রাচীনকাল থেকে হাসির সংজ্ঞা নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বজন সম্মত একটি সংজ্ঞা পাওয়া যায়নি। হাসির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা' বইয়ে বলেছেন, লৌকিক হাস্য যখন বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সঙ্গে মিশে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয় তখন সেটা হাসিতে পরিণত হয়।

সাহিত্যে হাসি প্রধানত চার প্রকার। যেমন, ১. করুণ হাস্যরস (Humour), ২. ব্যঙ্গারস (Satire), ৩. কৌতুকরস (Fun), ৪. বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস (Wit)। হিউমার হলো বিশুদ্ধ হাস্যরস। যে হাসিতে কোনো বিদ্বেষ বা অসূয়া নেই, যে হাসি অন্যের গায়ে জ্বালা ধরায় না, ব্যঙ্গের তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত করে না, সেটাই হলো হিউমার বা নির্মল হাস্যরস।

ব্যঙ্গারস হলো সেই হাসি, যে হাসি আমাদের মনকে প্রসন্ন না করে বিষণ্ন করে তোলে, যে হাসি আমাদের মনকে আনন্দে উজ্জ্বল না করে আঘাতে জর্জরিত করে তোলে সেই হাসি হলো ব্যঙ্গের হাসি। ব্যঙ্গাকার বড়ো কঠোর ও নির্মম। ব্যঙ্গের মধ্যে উপহাসের জ্বালা বড়ো বেশি। সেই জ্বালা আমাদের মনের মধ্যে তীব্র প্রদাহের সৃষ্টি করে। যার ফলে আমাদের মনে উপস্থিত সমস্ত ভালোবাসা, দরদ, আবেগ, সহানুভূতি প্রভৃতি সব কিছু ব্যঙ্গের কষাঘাতে শুকিয়ে যায়। মন সেখানে কোনো স্নিগ্ধ প্রলেপ পায় না। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অধিকাংশ গল্প এই স্যাটায়ারের উদাহরণ। হিউমার বা স্যাটায়ার থেকে একেবারেই অন্য গোত্রের হাসি হলো কৌতুক বা ফান। যেখানে মানুষ উদ্ভট অবস্থা বা উদ্ভট চরিত্র ও তাঁদের বিচিত্র কার্যকলাপ কল্পনা করে হাসে সেটাই কৌতুকরস। উইট হলো বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস। বিদ্যাকে যেমন অর্জন করতে হয়, উইটকেও তেমনি অর্জন করতে হয়। উইটের লেখক লোককে হাসান, কিন্তু নিজে হাসেন না। সাহিত্যে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে এই হাস্যরস তৈরি করতে হয়। হিউমারে থাকে লেখকের অভিজ্ঞতার প্রকাশ। কিন্তু উইটে থাকে পাণ্ডিত্যের প্রকাশ। গভীর মননের সঙ্গে উইটকে উপলব্ধি করতে হয়।

এর বাইরে ব্যবহারিক জীবনে আরো বেশ কয়েকরকম হাসি আছে। যেমন বিদ্রূপাত্মক হাসি, তাচ্ছিল্যের হাসি, প্রচ্ছন্ন হাসি, স্মিত হাসি, অট্টহাসি, লোক-দেখানো সৌজন্যের হাসি, না বুঝে বোকা বোকা হাসি, আবার বোঝার পর অজ্ঞতার কারণে নিজের মধ্যে লুকিয়ে হাসি, মেকি হাসি, বিকৃত হাসি, অশ্লীল হাসি, তৃপ্তির হাসি যা দৃশ্যমান নয়, অথচ চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ভালোলাগার হাসি, স্মৃতি রোমন্থনকারী হাসি, জীবনের প্রতি উদাসীন হাসি, অপত্য স্নেহের হাসি ইত্যাদি।

এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করব বিশিষ্ট রস-সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে সমাজের বিবর্তন নিয়ে। তাঁর গল্পে হাস্যরস প্রধানত স্যাটায়ার। তবে হিউমার যে নেই তা নয়। অনেক গল্পেই তাঁর সূক্ষ রসবোধের, এবং সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৬ সালের ২ ফেব্রুআরি। বাবা শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়। মা তুলসী দেবী। শৈশব কেটেছে ছোটোনাগপুরের নির্জন পাহাড়ি অঞ্চলে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ভিক্টোরিয়া স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশনে চাকরি নিয়ে চলে যান। তাঁর ইচ্ছে ছিল সন্ন্যাসী হওয়ার। কিন্তু তিনি বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে। কাজেই বাবার অমতে তাঁর সন্ন্যাস নেওয়া হয় না।

গম্ভীর কথার মোড়কে নয়, জ্ঞান দেওয়ার জ্যাঠামিতেও নয়, সমাজকে এঁকেছেন একেবারেই তাঁর নিজস্ব তুলিতে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের রচনার কেন্দ্রে রয়েছে মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবন। বাঙালির সমস্যাময় জীবন, সংকীর্ণ চরিত্র, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, সন্দেহপ্রবণতা ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলিকে নিয়ে অনায়াসে কৌতুক করেন তিনি। সমালোচনার কামান দাগা নয়, মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে ঘুঁষি মারার জন্য তেড়ে যাওয়াও নয়। বরং রয়েছে মৃদু এক চিমটি, যা আঘাত দেয় না তবে সম্বিত ফেরায়। তীব্র চিৎকারের চেয়েও মৃদু এক চিলতে হাসি হয়ে উঠতে পারে আরো তীব্র প্রতিবাদ। সব সমস্যাকেই আতস কাঁচে ফেলে সিরিয়াস নিদান দেওয়া নয়, বরং একেবারেই ভিন্ন আঙ্গিকে হাসির মোড়কে দেখার এবং দেখানোর চেষ্টা। তীব্র স্যাটায়ার এবং মাঝে মাঝে বুদ্ধিদীপ্ত উইট তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সমাজ বিবর্তনের এক রসময় দলিল। তিনি যে সময় থেকে লিখতে শুরু করেছেন, সেই সময় থেকে প্রতিদিন একটু একটু করে সমাজটা বদলে গিয়েছে। এই বদলটা ঘটেছে তাঁরই চোখের সামনে। আর সেই বিবর্তনের ইতিহাস তিনি হাস্যরসের মোড়কে গল্পের আকারে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। সঞ্জীব লিখতে শুরু করেন ছ'য়ের দশক থেকে। প্রথম দিকের গল্পে সমাজ সমস্যা অতটা গভীর ভাবে উঠে আসেনি যতটা এসেছে 'হালকা হাসি চোখের জল' গ্রন্থের গল্পগুলোতে। এই গ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলি চেনা ছকে বাঁধা নয়। তথাকথিত প্লট নেই বললেই চলে। শুরু থেকে শেষের যাত্রাপথ অনিশ্চয়তায় মোড়া। কোথায় গিয়ে থামবে, বা গল্প কোন দিকে মোড় নেবে, আগাম অনুমান করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল ভুলাইয়ায় হারিয়ে যেতে হয়। আসলে লেখক সচেতনভাবে কোনো গল্প বলতে বসেননি। খণ্ড খণ্ড কিছু মুহূর্তের দিকে আলো ফেলতে চেয়েছেন। ফলে সেই মুহূর্তটি যতটা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, কাহিনির বিন্যাস ততটাই যেন আবছা।

© Santiniketan Sahityapath

এখনকার যুগে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা বাড়ির বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের। বলা ভালো আমাদের মা-বাবাদের। প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়েই কেরিয়ার সর্বস্ব হওয়ায় বাড়িতে তাদের বাস নেই। অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে। প্রত্যেকেই বড্ড ব্যস্ত। বাবা-মা তাদের কাছে বাড়তি বোঝা। বাড়িতে রাখার জায়গা না থাকলে বৃদ্ধাশ্রম তো আছেই! 'বলদের গলায় গোড়ের মালা' গল্পে জনৈক ব্রজবাবুর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর তিন পুত্র বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত। আড়ম্বর এবং টাকা খরচায় কোনো কার্পণ্য নেই। কার্পণ্য ভক্তিতে। ছেলেরা সকলেই খুব উচ্চশিক্ষিত এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত। বড়ো ছেলে চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, মেজ ছেলে অ্যাডভোকেট, ছোটো ছেলে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়র। থাকে আমেরিকায়। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় সমাজের এই উচ্চবিত্ত শ্রেণিকে বড়ো মধুর কটাক্ষ করেছেন — 'বড় ছেলে জীবনে কখনও পা মুড়ে বসেননি। তিনি একটি বিপুল ভুঁড়ির মালিক। সেটি অবশ্যই অস্বস্তির কারণ। হাঁসফাস করছেন। থেকে থেকে মন্ত্র ফেঁসে যাচ্ছে। মন্ত্রের ফাঁকে ফাঁকে একটি স্বগতোক্তির প্রবেশ — এভাবে পারা যায়!'

এই বর্ণনা পড়লে আমরা না হেসে পারি না। এদের বাবা মারা গিয়ে খুব অপরাধ করে ফেলেছেন। তাই ছেলে-মেয়ে, পুত্রবধূদের এরকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে। মানুষ এখন শুধু দৌড়োচ্ছে। টাকার পেছনে। যশের পেছনে। তাদের কাছে বাবা-মায়ের জন্য শোকের সময় কোথায়! এরা টাকা খরচ করতে পিছপা হয় না। টাকার বিনিময়ে তাদের হয়ে অন্য কেউ যদি কেঁদে দিত, তাদের পিতৃশ্রাদ্ধের দায় থেকে উদ্ধার করত তবে বোধহয় এরা একটু শান্তি পেত — 'দ্বিতীয় ছেলে অ্যাডভোকেট, ক্রিমিনাল সাইডে কোর্টে সওয়াল জবাব করতে হয়। তিনি সেই কায়দাতেই মন্ত্র পড়ছেন। যেন পিতা এক ক্রিমিনাল। আর শাস্ত্রধারী পুরোহিত এই শ্রাদ্ধের জজসাহেব। পুত্র পিতাকে ছাড়াতে এসেছেন।'

ছোটো ছেলের অবস্থা আরো সাংঘাতিক। সে ভাবছে এই অ্যাডভান্সড টেকনোলজির যুগে পুরো শ্রাদ্ধটাকে কম্পিউটারাইজড করে ফেললে কেমন হয়। শ্রাদ্ধের এত উপকরণ ও আয়োজন অনুষ্ঠান তার কাছে অর্থহীন। তিনি ভাবছেন, 'আমেরিকায় ফিরে গিয়ে বাঙালির এই শ্রাদ্ধ পর্বটিকে কম্পিউটারে ঢুকিয়ে একটা প্রোগ্রাম তৈরি করলে কেমন হয়।' সে শুধু মন্ত্রের লিপ দিচ্ছে।

এতো গেল ছেলেদের কথা। কিন্তু যাঁর শ্রাদ্ধ নিয়ে এত কাণ্ড সেই ব্রজবাবু ছেলেদের এরকম আচরণ দেখে জ্যোতির্ময় শরীরে আর মর্ত্যলোকে না থেকে স্বর্গে ফিরে গেছেন। শ্রীভগবান তাঁর প্রত্যাগমনের কারণ জানতে চাওয়ায় তিনি দুঃখ করে বলেছেন যে, এই শ্রাদ্ধ শুধু তাঁর নয়, পশ্চিমবঙ্গে জীবিত অথবা মৃত সমস্ত পিতাদেরই শ্রাদ্ধ হচ্ছে। তাঁর বড়ো ছেলে এখন হুইস্কি দিয়ে ক্যাপসুল খায়। কারণ তাঁর শরীর এখন আর জল খেতে চায় না। তাই সে তার উদরে জলের পরিবর্তে মদ ঢালে, 'আগে চলে ভুঁড়ি পিছে চলে নর'।

অন্য লেখকদের মত সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ও সমাজের অবক্ষয়ের দিক মানুষের মূল্যবোধের বিকৃতির তীব্র সমালোচনা করেছেন তাঁর গল্পের মোড়কে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে ঘিরে শেষ পর্যন্ত কী হলো, লেখক সেই পর্যন্ত যাননি। উচ্চবিত্ত সমাজে, তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত পুত্রদের কাছে বাবার মূল্য কতখানি, তা এই গল্পে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। যে যার নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে, নিজের নিজের মতো করে এই শ্রাদ্ধের পর্বকে দেখছেন। জীবিত অবস্থায় বাবা যেমন বোঝা ছিলেন, মৃত্যুর পরও তিনি বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নন। বিবর্তিত সমাজের এই ছবিটাই হাস্যরসের মোড়কে বেআব্রু করেছেন।

বেশ কিছু গল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি সমাজের বিভিন্ন অসংগতির দিক তুলে ধরেছেন। সুস্থ সংস্কৃতি আমাদের দেশ থেকে উঠে গেছে। শিল্প এখন অবলুপ্তির পথে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের রুচি শুধু পরিবর্তন হয়েছে তাই নয়, অত্যন্ত নিম্নমানের হয়ে গেছে। এখনকার গানে কথা কম, বাদ্যযন্ত্রের হট্টগোল বেশি। কিছুক্ষণ শুনলেই মাথা ধরে যায়। নতুন শব্দদানব হয়েছে ডিজে। আট থেকে আশি ওই স্রোতেই গা ভাসাচ্ছে। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার এই অবক্ষয়িত রূপটাই তিনি তুলে ধরেছেন 'ভালবাসা মোরে ভিকিরি করেছে' গল্পে — 'এই যে হালফিল কালীপুজো গেল, কত আনন্দ দিয়ে গেল বলুন তো! ছেলেরা অষ্টপ্রহর গান শোনার ব্যবস্থা করেছিল। সারাদিন, সারারাত, মুহুর্মুহু বোমা ফাটিয়ে শরীরের রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে দিয়ে গেল। দু-চারজন টেসেও গেল মানে মোক্ষলাভ হলো।... আবগারি বিভাগের রোজগারও বেড়ে ছিল।... ইয়াং জেনারেশন একেবারে টং। বির্সজনের প্রশেসন যাচ্ছে।... দেখি কেউ প্রকৃতিস্থ নয়। সকলের মুখেই চুল্লুর গন্ধ। সমাজ সচেতন না হলে পারত এসব।'

এই ছবি আমাদের অতি পরিচিত। শুধু পরিচিত বলা ভুল। এইরকম নরকযন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে আমাদের অনেককেই দিন পার

করতে হয়। কাউকে কিছু বলার উপায় নেই। বাড়িতে হার্টের পেসেন্টের মরমর অবস্থা হলেও তাদের কিছু আসে যায় না। কারণ তাদের ফূর্তিটাই আগে প্রাধান্য পায়। ভক্তির নামে মদের ফোয়ারা ছোটে। একটা হুজুগে মাতবার সুযোগ পেলেই হলো। সে কালী হোক বা সরস্বতী। চার-পাঁচদিন রেখে দিয়ে যত খুশি আমোদ-প্রমোদের আয়োজন। লেখক সচেতন ভাবেই এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা সুদূর অতীতে ব্যবহার হতো না। যেমন, 'দু-চারজন টেঁসেও গেল'। সাতের দশক বা আটের দশকে নিশ্চিতভাবেই এমন ভাষার ব্যবহার ছিল না। তাছাড়া 'টেঁসেও গেল' শব্দ দুটি কোনো সাধারণ ছাপোষা গৃহস্থের মুখের ভাষা নয়। যারা প্রবল ভাবে মাইক বাজিয়ে সবার প্রাণ ওষ্ঠাগত করে দিচ্ছে, তাদেরই মুঝের ভাষা। সেই শব্দ যুগলকেও লেখক অবলীলায় নিজের ভাষ্যে টেনে এনেছেন। ফলে গল্প বা সংলাপ একদিকে যেমন অধিকতর বাস্তবমুখী হয়েছে, তেমনি বিবর্তনের তরী ভাসতে ভাসতে কোন বন্দরে নোঙর গেড়েছে, তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এরকমই আরেকটি গল্প 'বাঙালির পুচ্ছ নৃত্য'। এই গল্পে তিনি বাঙালির বার মাসে তের পার্বণকে কটাক্ষ করে বলেছেন — 'জাতিপুঞ্জে উন্নত স্বাধীন দেশের সম্মান আমরা চাই না। আমাদের ধর্ম হলো, লুট লে লুট লে। যে যেখানে যেভাবে আছে, সুযোগ পেলেই লুটে পুটে ফাঁক করে দাও।' এটা আমাদের সমাজের বাস্তব চিত্র। পুজো করার নামে মানুষের বিকৃত রুচির পরিচয় আমাদের সকলকে ভোগ করতে হচ্ছে। সবার আগে একটা বিরাট অঙ্কের চাঁদা। তার ওপর জাঁকজমক পূর্ণ আয়োজন। একে অপরকে টেক্কা দেবার পালা। ভক্তির ঢেউ ওথলালেও ভক্তি নেই। বিকট সুরে গানবাজনা, যে গানের একটা শব্দও বোঝা যায় না। কারো অসুবিধে হলে বলার উপায় নেই। পরের দিনেই তিনি পরলোকে চলে যাবেন। পুজোর নামে চলে চলে উদ্দাম নৃত্য, যথেচ্ছাচার।

পুজো তো বড়োলোকদের। গরিব মানুষ দু'বেলা খেতে পাচ্ছে না। কিন্তু সাধারণ মানুষের টাকার শ্রাদ্ধ করে থিম পুজোর প্রতিযোগিতা চলে। পারিবারিক পুজোর দেবী ভীতির দেবী। কারণ তাঁর এক কোপে সমগ্র বংশ নির্বংশ হয়ে যেতে পারে। আর বারোয়ারি পুজোর কালী উল্লাসের দেবী। সমাজ উচ্ছন্নে যাক, কেউ খেতে পাক, না পাক তাতে কিছু যায় আসে না। চারিদিকে আলো না থাকলেও পুজোর প্যান্ডেলে আলোর রোশনাইয়ে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। 'সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমীর বালাই নেই। ইচ্ছে করলে একমাসও ফেলে রাখা যায়। এই বেকার সমস্যার যুগে কিছুদিনের জন্য মায়ের কৃপার সাকার হওয়া যায়।'

একের পর এক আমাদের সমাজের বৈপরীত্য তিনি দেখিয়ে গেছেন। এক দিকে দরিদ্রের ঘরের স্বাধীন সরকার টেমি জ্বালাবার খরচটুকু দিতে পারেনি অথচ সারা দেশে আলো জ্বালিয়ে অলক্ষ্মীকে বিদায় করে লক্ষ্মীর আরাধনা করে। ১৯৪৭ সালে আমরা ইংরেজ শাসনের হাত থেকে মুক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি কি? স্বাধীনতার পর থেকে একের পর এক শাসক দল এসেছে। গাল ভরা প্রতিশ্রুতির বুলি আওড়েছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের ভোগান্তি, সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে গেছে। শাসক শ্রেণির এই ভণ্ডামির চিত্র রয়েছে 'ছত্রিশ বছর' গল্পটিতে। একজায়গায় তিনি লিখেছেন — 'সকলেই স্বপ্ন দেখছে গদির। রাজ্য ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছে।... গণতন্ত্র এখন মস্তানতন্ত্রের চেহারা নিয়েছে। যে যা করছে সবই বিপ্লবের ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছে। দেওয়ালে পেচ্ছাব করাটাও এখন বিপ্লব। পণের দাবীতে বউ পুড়িয়ে মারা-সেটাও বিপ্লব।'

রাজনীতি এখন শুধু আর দেশের দশের স্বার্থে নয়। রাজনীতি মানেই নিজের আখের গোছানো। দলহীন নিরপেক্ষ মানুষ এখন আর নেই বললেই চলে। এখন আছে শুধু দলের সমর্থক। 'গণতন্ত্র' এখন শুধুই একটা আভিধানিক শব্দ মাত্র। কারণ ব্যক্তিগত মতো প্রকাশের স্বাধীনতা এখন আর নেই। গণতন্ত্রের গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। একে অন্যের সঙ্গে মতবিরোধ থাকতেই পারে। তাই বলে তার কণ্ঠ রোধ করা হবে কেন? বেকার যুবক চাকরি পেল কি না সেই নিয়ে কেউ যাতে মাথা না ঘামায় সেই জন্য রাজনীতির নামে সাম্প্রদায়িকতাকে উসকানি দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রের কাছে সাধারণ মানুষের যা প্রাপ্য তা যেন তারা না খোঁজে, সেই জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে একটা বড়ো ইস্যু করে দেখানো হচ্ছে। শিল্প করার কোনো ইচ্ছে নেই শাসকদলের, অথচ মুখে বড়ো বড়ো ভাষণ আছে। এই গল্পে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন — 'ক্রমশই আমরা টেকনিক্যাল হয়ে উঠেছে। অন্য শিল্প তলিয়ে গেলেও বোমশিল্প, পাইপগানশিল্প, চাকুশিল্পের এখন রমরমা।... এ এক উলঙ্গ রাজার দেশ। সবাই ক্রুশ বিদ্ধ যীশু।' এই গল্পটি যখন তিনি লিখছেন, তখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত। চারপাশের চিত্র তাঁর মনে ক্রোধের জন্ম দিচ্ছে। কিন্তু সেই ক্রোধকেও প্রকাশ করছেন অন্য এক মোড়কে। 'দেওয়ালে পেচ্ছাব করাও এখন এক বিপ্লব'। দেশ ও সমাজের নামে, প্রতিবাদ ও আন্দোলনের নামে চারপাশে যা হচ্ছে, তাকে তিনি এভাবেই কটাক্ষ করেছেন।

© Santiniketan Sahityapath

আরো একটি ব্যতিক্রমী ঘরানার গল্প হলো 'জ্ঞানদা মোক্ষদা'। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন-চাকরি পেতে গেলে ওপর মহলে যোগাযোগ থাকা চাই। তা না থাকলে চাকরি পাওয়া যাবে না। হাসপাতালে ভর্তি হবার সুযোগও না। শুধু যোগাযোগেই শেষ নয়, মোটা অঙ্কের টাকাও ঘুষ দিতে হবে। এই চিত্রের কোনো পরিবর্তন আজও হয়নি। যে সমাজে সাধারণ মানুষ তার ন্যূনতম সম্মানটুকু পায় না, সেই সমাজ যে অনেকখানি পিছিয়ে আছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নষ্টভ্রষ্ট সভ্যতার এ এক বিধ্বংশী রূপ। মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে অন্য ছবিও এঁকেছেন লেখক। মুখে আমরা যতই প্রগতিশীলতার বুলি কপচাই আদৌ কি মেয়েদের নিরাপত্তা আমাদের সমাজে আছে? আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে চাইলে তাদের পরিণাম চিরদিনের মতো অ্যাসিডে পোড়া মুখ। প্রেম তো অনেক দূরের কথা। মেয়েদের আগে সম্মান করতে শিখতে হয়। এই গল্পে তিনি লিখেছেন — 'সভ্যতা মানে রেপিস্ট হওয়া নয়। সব মহিলা বারবণিতা হলে অঙ্কের সুবিধা হলেও পৃথিবীটা জারজে ভরে যাবে। বাবা শব্দটা থাকবে শুধু অভিধানে।' এখানেও ক্রোধকে এনে ফেলেছেন ব্যঙ্গের মোড়কে। 'বাবা শব্দটা থাকবে শুধু অভিধানে' — এই সংলাপ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। একটি বাক্যে যেন অনেক না বলা কথার ইঙ্গিত। আধুনিক সভ্যতা আসলে আমাদের কোন অন্ধকারের সরণিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, প্রবীণ লেখকের চোখে তা এড়িয়ে যায়নি। নারী স্বাধীনতা যে নিছক শহুরে সেমিনার ও গুরু গম্ভীর প্রবন্ধের বিষয় হয়েই থেকে গেছে, প্রান্তিক মানুষের জীবনে তার বিস্তার ঘটেনি — এ কথা লেখক বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন। পরিণত বয়সে এসেও তথাকথিত দার্শনিক সত্তা ঝেড়ে ফেলে তিনি হয়ে উঠেছেন আদ্যোপান্ত প্রতিবাদী। সমাজ বা রাষ্ট্রের রক্তচক্ষু তাঁকে বিচলিত করেনি।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় গল্পে সমাজের বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সবচেয়ে মজার জিনিস হলো এখনকার অতি মডার্ণ কালচারকেও তিনি বেশ সরস ভাবে উপস্থাপন করেছেন। এখন আমরা খুবই ব্যস্ত। সময় কোথায় সময় নষ্ট করার। সবাই দৌড়োচ্ছে। সম্পূর্ণ কথাটা বলতেও আমাদের কত বিরক্তি। তাই 'স্যাটা স্যাট' গল্পে তিনি লিখেছেন — 'এখন একটা যুগ পড়েছে, সে যুগের নাম 'স্যাটা স্যাট'। ফটাফট রুটি তৈরি, স্যাটা স্যাট মেরে দিয়ে ঝপাঝপ বেরিয়ে পড়।... জীবন এখন বর্ণমালার কয়েকটি মাত্র অক্ষরে সীমাবদ্ধ।' শ্মশানে যাওয়ার সময় আর কষ্ট করে 'বলো হরি হরি বোল' বলতে হয় না। সেটাও এখন মোবাইলে 'সিনক্রোনাইজ' করা থাকে। এখন নামের ক্ষেত্রেও সব শর্ট ফর্ম। মেথমেটিক্স কে ম্যাথ, হিস্ট্রিকে হিস্ট ইত্যাদি। বাবা-মা তো অনেককাল আগেই মম-ড্যাড হয়ে গেছে। ব্রাদার হয়ে গেছে 'ব্রো'। সিস্টার 'সিস' হয়ে শিস্ দিচ্ছে। 'এটা কোন যুগ' গল্পে সঞ্জীব এই সমাজের ওপর অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে লিখেছেন — 'একেই বলে ঘোড়া কালচার।... কোথায় প্রেম! জীবনের স্বাদ এখন চিরতার জলের মতো। ছেলেমেয়েদের অবস্থা শোচনীয়। একটা নম্বর কম পেলেই আত্মহত্যা। লেখাপড়ার কোনো দাম নেই। কিন্তু অনেক দাম দিয়েই কিনতে হবে।'

এখন সন্ধে বেলায় কারো বাড়ি গেলে এক কাপ চা পাওয়া তো দূরের কথা, সেই বাড়ির লোক বিশেষত মহিলারা চরম বিরক্ত হন। একটু কান পাতলেই তাদের চাপা গুঞ্জন শোনা যায় — আসার আর সময় পেল না। টিভির মেগা সিরিয়ালকেও তিনি বেশ সরস আক্রমন করেছেন 'যাও পাখি' গল্পে — 'মেগার একটা সুবিধে আছে, শেষ নেই। যে যেখানে, সে সেখানে। কারুর বয়স বাড়ে না, সমস্যারও সমাধান হয় না।'

এই গল্পেও সমাজের বর্তমান কালচারকে বেশ কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন। সাহেবরা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেও আমরা তাদের কালচার ছাড়তে পারিনি। আমরা কথায় কথায় এখন আমেরিকান স্টাইল ফলো করছি। স্বদেশে এখন বিদেশ এসে গেছে। ফাস্ট ফুড, ফাস্ট লাইফ, হাই স্পিড, ফাস্ট ম্যারেজ, ফাস্ট ডিভোর্স। এত কটাক্ষের মাঝেও তাঁর বর্ণনা আমাদের যথেষ্ট হাসি উদ্রেক করে, ''বাচ্চাটি সবে কথা বলতে শিখেছে। মাকে বলছে, 'মাম্মি মাম্মি, দ্রাম, মাম।' অর্থাৎ দ্রাম করে মারল তারপর 'মাম'— অর্থাৎ মৃত।''

ছেলে এখন বাবাকে ওল্ডফুল বলছে। পুত্রবধূ শাশুড়িকে খিটখিটে বুড়ি বলছে। তাও শাশুড়ির কপাল ভাল। ভাগ্যিস পুত্রবধূশিক্ষিত। সেকালের বউ হলে বলত 'মাগী'। ড্রেসের বাহারও কম নেই আমাদের, 'প্যান্টে আমেরিকা, জুতোয় হল্যান্ড, চুলে ব্রাজিল, ক্রাইমে ইতালি, জীবিকায়? ভাঁড়ে মা ভবানী।'

প্রবীণত্বের ছোঁয়া লাগলে অনেকেই বড়ো বেরসিক হয়ে যান। জীবন থেকে হাসি অনেক সময় হারিয়ে যায়। সহজ বিষয়কেও অহেতুক জটিল করে দেখার ও ভাবার প্রবণতা এসে যায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও একটা আশঙ্কা ছিল, বয়স হলে তাঁর রসবোধে হয়তো

© Santiniketan Sahityapath

টান পড়তে পারে। কিন্তু বয়সকালে যেন রসবোধ অটুট থাকে, সেই চেষ্টাও চালিয়ে গেছেন। তিনি যে খিটখিটে বুড়ো হবেন না, 'প্রহসিনী' কবিতায় তা আশ্বস্ত করে গেছেন —

'এত বুড়ো কোনোকালে হব নাকো আমি
হাসি-তামাশারে যবে কব ছ্যাবলামি।
এ নিয়ে প্রবীণ যদি করে রাগারাগি
বিধাতার সাথে তারে করি ভাগাভাগি
হাসিতে হাসিতে লব মানি।'

বর্ষীয়ান কথা সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়েরও যেন এটাই জীবন দর্শন। জীবনের প্রান্ত সীমায় এসেও তিনি তার সহজাত হাসিকে হারিয়ে যেতে দেননি। রসবোধে ভাটা পড়তে দেননি। নিরন্তর চর্চার মাঝে তাকে সজীব ও প্রাণবন্ত রেখেছেন। এই সময় ও সমাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকেননি। বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাষা ও শব্দচয়নও বিবর্তিত হয়েছে। ছ'য়ের দশক বা সাতের দশকে যে ভাষা বা যে উপমা ব্যবহার করেছেন, পঞ্চাশ বছর পর তাতেই আমূল সংস্কার এনেছেন। দ্বার বন্ধ করে ভ্রমটাকে আটকে রাখার চেষ্টা করেননি। চিন্তা ও চেতনার জগতে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত রেখেছেন। চার পাশের নানা অসংগতি দেখে চোখ কান বন্ধ রাখেননি। বরং বদলে যাওয়া সময়ের ভাষ্য থেকেই নির্মাণ করেছেন নব জীবনের উপাখ্যান। সযত্ন লালিত সাবেকি চেনা শব্দ ভাণ্ডারের আশ্রয় ছেড়ে আত্মস্থ করেছেন বদলে যাওয়া সময়ের ভাষাকে। উপমাতেও এনেছেন নিত্য নতুন আঙ্গিক। তাই তাঁর লেখাকে কখনোই সেকেলে তকমা এঁটে দেওয়া যাবে না। নতুন সময়ের দাবি মেনে নতুন পথ খুঁজে নিতে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। বয়স তাঁকে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার দিয়েছে, পরিণতি বোধ দিয়েছে। দিয়েছে সীমাহীন দূরদর্শিতা। কিন্তু এই বার্ধক্য তাঁর প্রকাশ ভঙ্গিকে প্রভাবিত করতে পারেনি। চলমান সময়েও তিনি তাঁর মতো করে হাসির উপাদান ঠিক খুঁজে নিয়েছেন।

বিবর্তনের নদীতে বারবার অবগাহন করেছেন। সমসাময়িক হয়ে ফিরে এসেছেন। তাই সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখনিকে কোনো সময়ের মানদণ্ডে বেঁধে রাখা সমীচীন নয়। তিনি যতটা সমকালীন, ততটাই চিরকালীন।

তথ্যসূত্র:

১। 'বলদের গোড়ায় গোদের মালা', সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, ১৯৭৭, ষষ্ঠ মুদ্রণ মে ২০১৪
২। 'কালের পুত্তলিকা', অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দেজ পাবলিশার্স, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, চতুর্থ সংস্করণ
৩। 'বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা', ড. অজিতকুমার ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, ১৮/এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ

—

© Santiniketan Sahityapath